দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম : একটি বিশ্লেষণ

মো: জামাল হোসেন*

সারসংক্ষেপ

হিন্দুধর্ম অনুসারে জগৎ ব্রহ্মার প্রকাশ। হিন্দু মরমীদের মতে, এই প্রকাশের ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমই সকল কিছুর প্রেরণা শক্তি; এই প্রেম অর্জনই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ বন্ধন হতে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়া। ব্রহ্ম পূর্ণতম ও শুদ্ধতম। সুতরাং ব্রহ্মকে পেতে হলে বা ব্রহ্মার সাথে মিলিত হতে হলে ব্রহ্মার ন্যায় পূর্ণত্ব বা শুদ্ধত্ব অর্জন করতে হয়। হিন্দুধর্মে মোক্ষ লাভ বা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবার জন্য জ্ঞান যোগ, কর্ম যোগ, ভক্তি যোগ এবং রাজ যোগ এই চারটি পথের উল্লেখ রয়েছে। এই পথ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেম ভক্তির কার্যকারিতাই সবচেয়ে বেশি। ভক্তি হচ্ছে প্রেমের উচ্চতর বিকাশের দ্বার স্বরূপ। প্রেমকে যথাযথ পথে পরিচালিত করতে, আয়ত্তে আনতে, এমনকি উচ্চতর জীবন্মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় ভক্তি। আর এই প্রেম-ভক্তির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করে হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়। হিন্দুধর্ম অনুসারে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভক্ত হৃদয়ে যখন তাঁর ভালবাসা জন্মে তখন ঈশ্বরের প্রেম তার চিন্তা, অনুভূতি ও অনুরাগের একমাত্র চালিকা শক্তি হিসেবে পরিণত হয়। এ অবস্থায় তিনি ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হন এবং ভগবানে (ঈশ্বরে) পরাভক্তি জন্মে। পরাভক্তি লাভ করলে ভক্ত এক উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নিত হন। অর্থাৎ তিনি রাগ-দ্বেষ, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, পরশ্রিকাতরতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করেন; সকলের প্রতি ক্ষমাশীল, দয়ালু ও মিত্র ভাবাপন্ন হন; সর্বোপরি ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে জগৎ ব্রহ্মার প্রকাশ। হিন্দু মরমীদের মতে, এই প্রকাশের ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমশক্তি নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, জীবজন্তুদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ভ এই প্রেমের প্রকাশ। এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি সকলের মধ্যেই এই ভগবত প্রেম আকর্ষণীয় শক্তিরূপে বিরাজ করছে। জগতের

* সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালি

মধ্যে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা শক্তি। এর অভাবে জগৎ মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই প্রেমই ঈশ্বর। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে, "কেহই পতির জন্য পতিকে ভালোবাসে না, পতির মধ্যে যে আত্মা আছে, তার জন্যই পতিকে ভালোবাসেন; কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালোবাসে না, পত্নীর মধ্যে যে আত্মা আছে, তার জন্যই পত্নীকে ভালোবাসে; কেহই কোন বস্তুর জন্য সেই বস্তুকে ভালোবাসে না, আত্মার জন্যই সেই বস্তুকে ভালোবাসে।"[১] আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ঐশী প্রেম। কাজেই ঐশী প্রেম আলোচনার জন্য আমাদের ঐশী প্রেম কী? এর স্বরূপ কী? ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেম কি সম্ভব? সম্ভব হলে এ প্রেম লাভের উপায় কী ও প্রেম লাভের অবস্থা কীরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. ঐশী প্রেম

যা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যকরূপে নির্মল হয়, যা অতিশয় মমতাযুক্ত এবং যা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব তাকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলে থাকেন। দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, '(প্রেম) নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অনুক্ষণ বৃদ্ধিশীল, কামনা ও গুণাদি পরিশূন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি অনুভূতি স্বরূপ।'[২]

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ অতি অল্প কথায় প্রেমের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম।' অর্থাৎ ইহলোকের কি পরলোকের সর্ববিধ সুখবাসনা ত্যাগপূর্বক এমন কি নিরূপাদি শ্রীকৃষ্ণসেবা বশত স্বতঃই যে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দের প্রতিও বাসনাশূন্য হয়ে সেবাযোগ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণ সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার যে বাসনা তাই প্রেম। সাধারণত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির প্রতি যদি অনুরাগ হয় তাহলে তার প্রিয় সম্বন্ধীয় কোন কথা হলেই অনুরাগীর অশ্রুপুলকাদি ভাবের দ্বারা ইহা প্রকাশ পায়। একইভাবে ভগবান সম্বন্ধীয় প্রেমভাবও ভক্তের অশ্রুপুলকাদি দ্বারা প্রকাশ পেয়ে থাকে। প্রেমের প্রথম লক্ষণই ভাব। যার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর জন্মে তার মধ্যে স্মরণ, কীর্তন, মনন ও অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়।

ঐশী প্রেম হলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রেম, মানবাত্মার সাথে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রেম। তবে ইহা এমন কোন বিষয় নয়, যাকে আমরা গভীর যত্ন অথবা আত্মসংবেদন (Self hypnotism) অথবা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টি করতে পারি। ইহা হল মানব হৃদয়ে স্থিত স্থায়ী অগ্নিশিখা সদৃশ যা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুশীলন এবং অন্যান্য ভক্তের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে যখন ইহা শক্তিশালী হয় তখন আমরা একে জানতে পারি।[৩] ঐশী প্রেম সকল ধর্মের ভিত্তি এবং ধার্মিকের অতি কাঙ্খিত বিষয়।

১.১ ঐশী প্রেমের লক্ষণ

হিন্দুধর্ম মতে প্রেম সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। ইহা উপলব্ধির বিষয়, মানবীয় ভাষায় একে ব্যক্ত করা যায় না। ইহার বীজ মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং ঈশ্বরের নাম শ্রবণ, কীর্তণ ও স্মরণের মাধ্যমে ইহা বর্ধিত হতে থাকে।[৪] অর্থাৎ সাধনার মাধ্যমে হৃদয় পূত পবিত্র হলেই তথায় ঐশী প্রেমের উদয় হয়। তবে মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো সর্বদাই লক্ষ্য রাখা যে, পার্থিক আশা-আকাঙ্খা, লোভ-লালসা ও অন্যান্য কুপ্রকৃত্তি যেন প্রেমের কচি গাছকে নষ্ট না করে। মরমী অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ভগবত (ঈশ্বর) ভক্তগণ এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এর স্বরূপ ব্যখ্যায় সচেষ্ট হয়েছেন।[৫]

লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য:

(ক) ঐশী প্রেমে আদান-প্রদান বা লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন নেই।

(খ) প্রেমে কোনরূপ ভয় নেই।

(গ) প্রেম উচ্চতম আদর্শ ।

(ঘ) প্রেম অনির্বচনীয়, বাক্যের দ্বারা এর স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না।

(ঙ) প্রেম কেবল অনুভববেদ্য।

(চ) প্রেম গুণশূন্য।

(ছ) প্রেম কামনাশূন্য।

(জ) প্রেমানুভবে বিচ্ছেদের কোন অবকাশ নেই।

(ঝ) প্রেম হচ্ছে সূক্ষ্মতর।

(ঞ) প্রেমতত্ত্বে যেমন এক বহু হচ্ছে তেমনি ঐ বহুও একের আকর্ষণে একের সাথে মিলিত হচ্ছে।

৩. ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেম

ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেম হতে পারে কিনা এ সম্পর্কে গীতা ও পুরাণের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ঈশ্বর মানুষের সঙ্কটকালে তাঁর অসাধারণ শক্তি বলে নরদেহ ধারণ করে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হন, গীতায় একথা স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত অবতার শ্রীকৃষ্ণের ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য দু'টি: প্রথমত: দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে সৎলোকদের সংরক্ষণ ও ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করা; দ্বিতীয়ত: মানবকে দিব্য কর্মের আদর্শ দেখিয়ে দিব্য জীবনের দিকে ধাবিত করা, এবং সার্বভৌম ভাগবত ধর্মের প্রচার দ্বারা জীবকে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করা।[৬] তাই গীতায় অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্তরাখ, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি তুমি আমাকেই পাবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়।"[৭] ভাগবৎগীতায় আরো বলা হয়েছে মানুষের প্রতি ভগবানের অকৃত্রিম প্রেম ও করুণাই তাঁকে ধরাপৃষ্ঠে নিয়ে আসে। ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করে তিনি মানবিক কল্যাণে এমন কর্ম করেন যা মানুষের মন ও হৃদয় হরণ করে, যার ফলে মানুষ তাঁর প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হয়ে উঠে।[৮] ভগবানের এই অবতার লীলার মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারে যে, তার পক্ষে চেতনার এমন এক স্তরে পৌঁছা সম্ভব যেখানে সে একই সঙ্গে মানুষ ও দেবতা দু'ই হতে পারে।[৯] ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করে নিজেকে মানবরূপে পরিবর্তিত করে মানুষের মন ও হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আসেন। আর এভাবেই তিনি মানুষকে তাঁর নিজের ঐশী স্বভাবের দিকে আকৃষ্ট করে অতি উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে চান। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, ভগবান মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং মানুষও তার প্রেমাস্পদ-ভগবানকে ভালোবাসেন।

৪. ঐশী প্রেম লাভের উপায়

হিন্দুধর্মানুসারে মানবজীবনের লক্ষ্য হচ্ছে-জন্ম-মরণ বন্ধন হতে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া বা পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়া। কিন্তু ব্রহ্ম পূর্ণতম এবং শুদ্ধতম সত্তা। সুতরাং ব্রহ্মকে পেতে হলে বা ব্রহ্মের সাথে মিলিত হতে হলে ব্রহ্মের ন্যায় পূর্ণত্ব বা শুদ্ধত্ব অর্জন করতে হবে। যতক্ষণ মানুষ তার জৈবিক দেহের সঙ্কীর্ণতা ও কামনার নাগপাশে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ অসীমের সাথে মিলিত হবার কল্পনা আকাশ-কুসুম মাত্র। নিজেকে দৈহিক কারাগার হতে মুক্ত করে দেবত্বে আরোহণ করতে পারলেই মানুষ ব্রহ্মের সাথে মিলিত হতে পারে। হিন্দুধর্ম এবং দর্শনের স্পৃহা হচ্ছে নরত্ব হতে দেবত্বে উত্তরণের দীক্ষা দেওয়া, যাতে মানুষ এক উচ্চতম নৈতিক আদর্শে পৌঁছতে পারে। অবশ্য এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ঋষি, সাধক এবং শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন। এ গুলো

হলো জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এবং রাজ (ধ্যান) যোগ। এসবগুলো পথেরই গন্তব্যস্থল এক এবং সাধক যে পথই নির্বাচন ও অনুসরণ করুক না কেন, মোক্ষ পথযাত্রীর বিশিষ্ট পাথেয়গুলো সব পথেই সমভাবে অপরিহার্য। তবে মোক্ষ লাভের পথ গুলোর মধ্যে ভক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সহজতর[১০] এবং শ্রেষ্ঠতর (গীতা, ৬/৪৬-৪৭)। কারণ অনুরাগ বা ভালোবাসা মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ এবং এই স্বাভাবিক আবেগের উপরই ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিমার্গের ক্ষেত্রে এই অনুরাগ ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়। গীতা অনুযায়ী, "সর্বভূতে অবস্থিত পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়, আর কিছুতে নয়।" (৮/২২)

উল্লেখ্য যে, মানবসত্তা গঠিত জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম- এ তিনটি বৃত্তি নিয়ে। অভাব বা প্রয়োজন থেকে কর্মের সূত্রপাত। পরমসত্তা পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং তাঁর অভাব, প্রয়োজন কিংবা দুঃখ বলতে কিছু নেই। আর তা নেই বলেই কর্মমার্গে ভগবৎ সাধনা বৃথা। জ্ঞানের পথেও সব মানুষের পক্ষে পরমার্থিক সত্তার সন্ধান লাভ সম্ভব নয়; কারণ পারমার্থিক সত্তার জ্ঞান সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। এ ক্ষেত্রে প্রেম-ভক্তির কার্যকারিতাই সবচেয়ে বেশি। প্রেম সব দেশের, সব যুগের, সর্বস্তরের মানুষের অভিন্ন সম্পদ হলেও হিন্দুধর্মে প্রেমের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়।[১১]

ভক্তিযোগ হচ্ছে প্রেমের উচ্চতর বিকাশের দ্বার স্বরূপ। প্রেমকে যথাযথ পথে পরিচালিত করতে, আয়ত্তে আনতে, এমনকি উচ্চতর জীবন্মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় ভক্তি। প্রকৃতির গুণে মানুষ কামনা-বাসনায়, সুখে- সৌন্দর্যে সদাসক্ত। ভক্তিযোগ সেই আসক্তিকে দূর করে ভক্তকে সত্যিকার প্রেমাস্পদ ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। জগতিক আসক্তি হ্রাসের ফলে মন অনন্ত প্রেমাধারের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৪.১ ভক্তি

ভক্তি শব্দটি ভজ্ ধাতু থেকে উদ্ভূত। ভজ্ শব্দের অর্থ বিভাগ, হিস্যা, অংশ, দেওয়া ও লওয়া ইত্যাদি। বৈদিক সাহিত্যে ভজ্ বলতে পশু বলিদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বুঝাত। পরবর্তী সাহিত্যে ভক্ত ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রকাশ করতে ভজ্ শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করা হত।[১২] কাজেই উৎপত্তিগত দিক থেকে ভক্তি বলতে বুঝায় বণ্টন, বিভাজন, অংশগ্রহণ। শব্দটি আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে। যেমন আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক, আবেগ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, ভক্তি বলতে বুঝায় প্রেম অথবা অনুরাগ। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বা প্রেমপূর্ণ অনুরাগ, আত্মসমর্পণ, ঐশী সত্তায় অংশগ্রহণ।

ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমময় অনুরাগই হলো ভক্তি।[১৩] অন্যভাবে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ঈশ্বরে ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর জন্য মানবীয় প্রেম, তাঁর সেবায় সবকিছু উৎসর্গ করা এবং জ্ঞান, কর্ম বা ত্যাগের মাধ্যমে মোক্ষ অর্জনে ব্রতী না হয়ে মোক্ষ লাভ করার নাম ভক্তি।[১৪]

বেদান্ত মতে, ঈশ্বরের প্রতি পরার নিরতিশয় যে প্রীতি তাকে ভক্তি বলে। বেদান্ত দার্শনিক রামানুজ ধ্যান বা ভক্তিকে 'তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সন্তান রূপ ধ্রুবা স্মৃতিঃ (শ্রীভাষ্য ১/১/১) বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এক পাত্র হতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান বা ভক্তি। বেদান্ত দার্শনিকদের মতে, ভক্তি হলো জ্ঞান ও কর্মের সমন্বিত রূপ।

বেদে ভক্তি বলতে বুঝায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। মহাভারত এবং রামায়ণে ভক্তি শব্দটি জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় প্রেম নির্দেশ করেছে। ধর্মীয় দিক থেকে ভক্তি বলতে শুধু ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম এবং অনুরাগই বুঝায় না বরং ঈশ্বরের মানুষের প্রতি ভালোবাসা বুঝায়। গীতায় ভক্তি হলো মুক্তি লাভের উপায় (১৮/৫৫) এবং লক্ষ্য (১৮/৫৪) উভয়ই।

সর্বোপরি গীতায় ভক্তি বলতে বুঝায় ঈশ্বরের ভক্তের প্রতি ভালোবাসা। কৃষ্ণ তাঁর সহচর অর্জুনের প্রতি যেমন সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল তেমনি তাঁর ভক্তের প্রতি। তাই তিনি বলেন: "যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি (৪/১১)। তাঁর ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না (৯/৩১)। তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজেকে ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে ভক্তের সমস্ত সঙ্কট এবং সকল সংশয় দূর হয় (১৮/৫৮,৭৩)। এবং তিনি তাদের পরম শান্তি (মুক্তি প্রদান) ও চিরন্তন স্থান প্রদান করেন (১৮/৬২)।" সুতরাং আধ্যাত্মিক পথ হিসেবে ভক্তিযোগ মানুষের ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা, তাঁর সেবা করা, তাঁর জন্য আত্মত্যাগ করা, ঈশ্বরেরও মানুষকে অনুরূপ ভালোবাসা এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে আনন্দময় মিলনের দ্বারা গঠিত। এর উপাদানসমূহ হচ্ছে ব্যক্তিগত ঈশ্বর, ঐশ্বরিক করুণা, ভক্তের আত্মনিবেদন ও প্রেম; বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সার্বজনীন মুক্তির আশ্বাস এবং নিগূঢ় মিলন।

৪.১.১ ভক্তির তাৎপর্য

ভক্তি একদিকে যেমন মানুষের সমস্ত পাপকে মোচন করে, অন্যদিকে ইহা মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে। একজন সাধারণ ভক্ত যিনি প্রায়ই ইন্দ্রিয় সুখ দ্বারা পরিচালিত

হন, তিনিও যদি ভক্তিমার্গের অনুশীলন করেন তবে ভক্তির দ্বারা তিনি এতই পবিত্র হন যে, তিনি আর ইন্দ্রিয় সুখ দ্বারা পরিচালিত হন না। ভক্তি ব্যতীত কর্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত নৈতিকতা মানুষকে পবিত্র করতে পারে না।[১৫] হিন্দু মরমীদের মতে, যারা ইন্দ্রিয় সুখে পরিতৃপ্ত তারা স্বর্গ লাভের আশায় পূজা অর্চনা করে থাকে। যারা এর চেয়ে উচ্চস্তরের, কামনাহীন জীবনে যারা অভ্যস্ত তারা কর্মযোগের অনুশীলন করেন। অন্যদিকে যারা অতি উচ্চতর জীবনে অভ্যস্ত তারা জীবনের বাধ্যতামূলক কর্মসমূহ পালন করে কোনরকম ফল প্রত্যাশা ছাড়াই। যারা পরবর্তী উচ্চ স্তরের মানুষ তারা ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য যোগ অথবা জ্ঞান অথবা যে কোন প্রকার ভক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে ভক্তির পথ তাদের জন্য সর্বোত্তম, যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্তও নয় আবার বিষয়াসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও নয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা ভক্তির অনুশীলন করে তাদের মনকে পবিত্র করতে পারে এবং ঈশ্বরের নিকটে নিজকে সমর্পিত করে ঈশ্বর ভিন্ন অপর সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে তার প্রেমের মধ্যে সর্বোত্তম আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। এভাবে তারা অতি ভক্তিময় জীবনযাপন অনুশীলন করতে পারে।[১৬]

৪.১.২ ভক্তিযোগের পরিচয়

বর্তমান যুগে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেই প্রধানত ভক্তিমার্গী বলে চিহ্নিত করা হয়। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সারকথা হলো প্রেম-ভক্তি করুণা। অপরের কল্যাণে আপন স্বার্থত্যাগ তথা বিশ্বজনীন প্রেমানুভূতির উপর রচিত সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি। আমরা যাকে বৈষ্ণবধর্ম বলি তার প্রধান অনুষ্ঠান-শ্রী বিষ্ণুর নামকীর্তন। বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে সবচেয়ে প্রাচীন দলিল ঋগ্বেদ সংহিতা। তাতেই ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূলসুর। বৈষ্ণব মতে জ্ঞানে নয়, কর্মেও নয়, প্রেম ভক্তির মাধ্যমে কেবল সসীম মানুষের পক্ষে পরম ঐশী প্রেম অর্জন ও উপলব্ধি করা সম্ভব। আর প্রেমের মাধ্যমে তা করতে হলে মানুষের প্রয়োজন ভগবানের মাধুর্যরূপ প্রত্যক্ষ করা এবং ভগবানের দর্শন লাভের সাধনায় রসমধুর ভাবের পদ্ধতি অবলম্বন করা। একথাই যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভগবৎ গীতায়। একই কথা বলা হয়েছে শ্রুতি, উপনিষদ, আগামশাস্ত্র ও পুরাণে। কাজেই ভক্তিযোগ তথা হিন্দ-মরমীভাবধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৪.১.৩ বৈষ্ণব ধর্মের পরিচয়

বৈষ্ণব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'বৈষ্ণব' শব্দের অর্থ বিষ্ণু বা বিষ্ণু সম্বন্ধীয়।[১৭] সুতরাং যেমন বিষ্ণুর উপাসককে বা ভক্তকে, তেমনি বিষ্ণুর

বা বিষ্ণু সম্বন্ধীয় অপর কোন বস্তুকেও বৈষ্ণব বলা যায়। এই উভয় অর্থে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যবহার পুরাণাদিতে বহুল পাওয়া যায়। 'বিষ্ণুভক্ত' অর্থে বৈষ্ণব শব্দের প্রয়োগ বেদের সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং প্রধান প্রধান উপনিষদে নেই। অষ্টোত্তরশতোপনিষদের মধ্যে পরিগণিত একমাত্র মুদগলোপনিষদে ঐ প্রয়োগ একবার মাত্রই আছে। তবে কোন কোন পুরাণে বৈষ্ণব এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন পদ্মপুরাণে আছে "বিষ্ণুসেবক বৈষ্ণব।"[১৮] "একমাত্র বিষ্ণুই যার শ্রোতব্য, স্মর্তব্য, কীর্তণীয়, পূজ্য এবং আরধ্য সেই বৈষ্ণব বলে সমাদৃত হয়। ... হে মুনি ! যে নিত্য বিষ্ণুর উপাসনা করে, একমাত্র বিষ্ণুই যার ঈশ্বর, পূজ্য এবং ইষ্ট, সংসারে সেই বৈষ্ণব।"[১৯] কাজেই পুরাণ অনুসারে যিনি অপর দেবতাকে পরিত্যাগ করে শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেছে, অকাম বা মোক্ষকাম বা সকাম বিষ্ণুতে ও বৈষ্ণবেই সদা নিবদ্ধ হৃদয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থ, পঞ্চরাত্রানুসারে শ্রুতিস্মৃত্যুদিত ধর্ম, বর্ণাশ্রম বিভাগ সম্যক আচরণ করে বিশুদ্ধাত্মা হয়ে, গুহ্যকর্ম পরিত্যাগ করে, ভাগবত বেশ ধারণ করে ভগবানের বিমল জন্মকর্মোৎসবাদি করে, সেই প্রাজ্ঞ পরম বৈষ্ণব বলে পরিচিত।

৪.২. ভক্তি তথা ঈশ্বরানুরাগের জন্য প্রয়োজন নৈতিক বিশুদ্ধতা

ভক্তি তথা ঈশ্বরানুরাগের জন্য মুক্তিকামী সাধকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরানুরাগী হতে পারে না যদি না তার ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ব্যক্তির মনে তখনই জাগ্রত হয় যখন ব্যক্তি কোন-না-কোনভাবে জানে ও বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর করুণাময় এবং জীবের কল্যাণকামী। এই বিশ্বাস বা জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে দু'ভাবে আসতে পারে- আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ব্যক্তির বিচারমূলক জ্ঞান থেকে এবং শাস্ত্রের বা গুরুর উপদেশ থেকে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যক্তির মনে জাগ্রত হতে পারে না বা সুদৃঢ় হতে পারে না যদি মন অশুচি, চঞ্চল ও অস্থির থাকে। দেহ-মনের শুচিতার জন্য সাধারণত প্রয়োজন অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস এবং রাগ-দ্বেষ মোহমুক্ত হয়ে কর্ম সম্পাদন করা। যখন ব্যক্তির দেহ মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে তখন শাস্ত্র বাক্য পাঠ করে এবং গুরুর উপদেশ শ্রবণ করে তার মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত হয়। কাজেই ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উপেক্ষা করতে পারেনা। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন।[২০]

চিত্তশুদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মন বুদ্ধির একাগ্রতা সম্পাদন। ইন্দ্রিয় ও বিষয়বুদ্ধি তাড়িত চঞ্চল মনের দ্বারা পরমসত্তার ধারণা করা সম্ভব নয়। তাই পরমসত্তার দর্শন বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্য প্রয়োজন স্মৃতিলম্ভ বা অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি অর্থাৎ যে

নির্মল বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পৃথিবীর উর্ধ্বস্থ সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তা করা সম্ভব, প্রজ্ঞান বা বিজ্ঞান।[২১] ইহার কোনটাই চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অর্জন করা যায় না।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে (১৬/১-৩) চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছাব্বিশটি সাত্ত্বিক গুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত কুড়িটি জ্ঞানীর লক্ষণ প্রায় একই। এই গুলো মোক্ষ পথের সহায়ক। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই এই গুণগুলোর অনুশীলন করা প্রয়োজন। এগুলো হলো- নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্মযোগে তৎপরতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জন, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, (অক্রৌর্য), কুকর্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, দ্রোহ বা হিংসা না করা, অনভিমান।

অন্যদিকে দেবর্ষি নারদের মতে নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রপঞ্চিত সনাতন ধর্ম এই ত্রিশ লক্ষণ যুক্ত।[২২] যথা- (১) সত্য, (২) দয়া, (৩) তপঃ, (৪) শৌচ, (৫) তিতিক্ষা, (৬) ঈক্ষা (বা বিচার) (৭) শম, (৮) দম, (৯) অহিংসা, (১০) ব্রহ্মচর্য্য (১১) ত্যাগ, (১২) স্বাধ্যায়, (১৩) আর্জব, (১৪) সন্তোষ, (১৫) সমদৃষ্টি (১৬) সেবা, (১৭) গ্রাম্যেহোপরম, (১৮) মনুষ্যের ভাগ্য বিপর্যয় বিচার, (১৯) মৌন, (২০) আত্মবিচার, (২১) সমস্ত প্রাণীদিগতে বিশেষত মনুষ্যদিগেতে আত্মবুদ্ধি ও ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং সেইহেতু অন্নাদির যথাযোগ্য সংবিভাগ (২২-৩০) ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, অবনতি, দাস্য, সখ্য এবং আত্মসমর্পন (নবধা ভক্তি)। এগুলো মানুষের পরমধর্ম, এগুলো পালন করলে সর্বাত্মা হরি সন্তুষ্ট হন এবং আপনাকে প্রদান করেন। অর্থাৎ ভক্তের নিকট আপন প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন, যাতে সে তাঁর মায়া অতিক্রম করে।

গীতা এবং ভাগবত জ্ঞান-ভক্তি নির্বিশেষে সকল যোগীর পক্ষেই দৈবী সম্পদের যে তালিকা দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেগুলো উপনিষদ নির্দেশিত কয়েকটি পন্থা হতে উদ্ভূত এবং পরম সত্তাকে লাভের প্রাথমিক পদক্ষেপ-চিত্ত শুদ্ধির জন্য এ গুলো অপরিহার্য। নিম্নে ক্রমানুসারে এগুলো আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য যে, মানুষের আধ্যাত্মিক স্তর বা গ্রহণ ক্ষমতার ভিন্নতা হেতু বর্তমান তালিকাভুক্ত চিত্তশুদ্ধির আঙ্গিকগুলোর মধ্যে কোনটি কখন অবলম্বন করতে হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক মার্গ ও সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য যেহেতু এক ব্রহ্মত্ব লাভ করা, তাই ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করতে হলে নিম্নোক্ত প্রায় সবগুলো সোপানই অতিক্রম করতে হবে।

(১) যম

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ অর্থাৎ দান কিংবা উপহার গ্রহণ না করা (রাজযোগের) এই পঞ্চাঙ্গ সাধনকে বলা হয় যম। ইহা প্রত্যেক নর-নারী, জাতি, দেশ-কাল নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করতে হলে এ গুণগুলো অর্জন করা প্রয়োজন। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো।

(ক) অহিংসা

অহিংসা অর্থ সর্বভূতের (মানুষ, পশু বা হীনতর প্রাণী) প্রত্যেকের প্রতিই শত্রুভাব, ঘৃণা, এমনকি কারও অনিষ্ট চিন্তা পর্যন্ত ত্যাগ করা। হিন্দুধর্মের এই অহিংসা বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমাত্মা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছেন। এই সমদর্শন যিনি উপলব্ধি করেন তিনি বুঝেন যে অপর কোনো জীবকে হত্যা বা হিংসা করার অর্থ হলো নিজের আত্মাকেই হিংসা করা। এই রূপ কায়মনোবাক্যে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হলে একমাত্র অহিংসা দ্বারাই সেই সাধক মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন।

(খ) সত্য

আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে প্রয়োজন অবিচল সত্যনিষ্ঠা। সত্য অর্থ সত্য ভাষণ, সত্যের উপলব্ধি ও অনুষ্ঠান। গীতায় সত্যকে বাঙময় বা বাচিক তপস্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে (১৭/১৫)। উপনিষদ মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু। কাজেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে ভক্তকে সত্যভাষী ও সত্য প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

(গ) অস্তেয়

সাধারণত অস্তেয় অর্থ চুরি না করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে অস্তেয় শব্দটি ব্যপকতর অর্থে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পর দ্রব্যের প্রতি নিস্পৃহ এই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য হলো হিন্দুধর্মের চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন, ইহাতে শুধু যে অবিবাহিত জীবন বুঝায় তা নয়, বরং ইহাতে সর্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়ানুশাসন সূচিত হয়। কর্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মনের দ্বারা সর্বদা যৌনাচার ত্যাগের নাম

ব্রহ্মচর্য। এ অবস্থায় সাধক যা অর্জন করতে চান তা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা, যার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখী করা। ব্রহ্মচর্য তারই ভিত্তি ।

(ঙ) অপরিগ্রহ

যে কোন অবস্থায় কারো নিকট হতে দান কিংবা উপহার গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। দান ইত্যাদি গ্রহণে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, চিত্তের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, মানুষ হীন হয়ে যায়। অপরিগ্রহের মূলে দু'টি গুণ বিদ্যমান-একটি স্বাবলম্বন অপরটি বৈরাগ্য।

(২) নিয়ম

রাজযোগের অষ্টাঙ্গ সাধনের দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিয়ম। ইহার পাঁচটি অঙ্গ- শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান । এগুলো রাজযোগের অন্তর্গত হলেও অন্যান্য মার্গাবলম্বিগণের পক্ষেও অবশ্য কর্তব্য।

(ক) শৌচ

শৌচ বলতে সাধারণত পরিচ্ছন্নতা বুঝায়। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য যে শৌচ অবলম্বন করা প্রয়োজন তা দ্বিবিধঃ বাহ্যশৌচ এবং আন্তঃশৌচ। ইহারা সাপেক্ষ। মৃত্তিকা, জল ইত্যাদির সহায়তায় দৈহিক শুদ্ধি সম্পাদনকে বাহ্যশৌচ বলে।[২৩] অন্যদিকে আন্তঃশৌচ বা মনঃ শুদ্ধি অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা লভ্য। এ প্রসংগে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ধর্মের অনুশীলন এবং পিতা ও আচার্যের নিকট হতে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে অধ্যাত্মবিদ্যা অর্জন করে মনঃশুদ্ধি সম্পন্ন করতে হয়। মনঃ শুদ্ধির জন্য কামনাও ত্যাগ করতে হয়। এই জন্য ভাগবত বলেন যে, প্রকৃত শৌচ- স্নানাদি বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হবে না, ইহার জন্য প্রয়োজন কর্মে বা কর্মফলে পূর্ণ অনাসক্তি।[২৪] মহাভারতে মানসিক সুকৃতিকে অভ্যন্তর শৌচ বলা হয়েছে। ইহার উপাদান সর্বজীবের কল্যাণ কামনা, সত্যাশ্রয়, সরলতা, ব্রতোপবাস, ব্রহ্মচর্য, দম ও শম।

(খ) সন্তোষ

সন্তোষ অর্থ জীবনযাপনের জন্য যখন যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

(গ) তপস্যা

একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধির জন্য তপস্যার প্রয়োজন। এই জন্য ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পাদসমূহের অন্যতম বলা হয়েছে। ব্রহ্ম দর্শন ব্রহ্মেরই কৃপাসাধ্য। তপস্য সেই কৃপালাভ করাবার জন্য একটি উপায়।

(ঘ) স্বাধ্যায়

মন্ত্র জপ, বেদপাঠ বা ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। উপনিষদ অনুসারে আত্মাকে দর্শন করতে হলে শ্রবণ, মনন ও ধ্যান এই তিনটি উপায়কে পর্যায়ক্রমে অবলম্বন করতে হবে।[২৫]

(ঙ) ঈশ্বর প্রণিধান

ব্রহ্মের সাকাররূপ ভক্তি সহকারে পূজা করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। ঈশ্বর উপাসনার অন্যতম মাধ্যম প্রতীক উপাসনা। প্রাকৃতিক বস্তু অথবা চিহ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর অথবা দেব-দেবীর উপাসনা প্রতীক উপাসনা হিসেবে বিবেচিত। বস্তুতপক্ষে প্রতীক এবং প্রতীমা উভয়ের উপাসনা হল ঈশ্বরের উপাসনা।

(৩) জপ

জপ শব্দের অর্থ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি। অর্থাৎ আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম দর্শনের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ আত্মার চিন্তা ও ধ্যানকে জপ বলে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জপ বা অভ্যাস দ্বিবিধ [২৬] (ক) অধীত শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-- ইহাকে স্বাধ্যায়েরই অঙ্গ বলা যেতে পারে। (খ) গুরু উপদিষ্ট বেদনির্দেশিত মন্ত্রের অভ্যাস। ভক্তি মতে ইষ্টমন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করলে ইষ্ট দেবতা, সেই মন্ত্রের ধ্যানমূর্তিতে সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হন।

(৪) দম

দম, শম সাধনার প্রাথমিক পর্যায়। বিষয়সমূহ হতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রত্যহৃত করে তাদের নিজ নিজ স্থানে নিশ্চল অবস্থায় নিরুদ্ধ করাকে দম বলা হয়।[২৭] ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। অন্তরিন্দ্রিয় চারটি- মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। অন্যদিকে বহিরিন্দ্রিয় দুই প্রকার- কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। আবার কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি যথা, বাক্, পানি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (লিঙ্গ) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়

পাঁচটি যথা, কর্ণ, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা- যা দ্বারা আমরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আস্বাদন করি। এ বহিরিন্দ্রিয়সমূহের সংযমকে দম বলে। ইহা দুরূহ সাধন। তাই নির্জনবাস দম অভ্যাসের অনুকূল।

(৫) শম

অন্তরিন্দ্রিয় সংযমকে শম বলা হয়, সাধকের লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মার সাথে মিলন। সেই লক্ষ্যে চিত্তকে নিশ্চলরূপে এবং নিয়ত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয় হতে বৈরাগ্যের দ্বারা বিরত করে অহং বাসনা বা দেহাভিমান ত্যাগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়াই শম।

(৬) দান

ছান্দোগ্য উপনিষদে দানকে ধর্মের প্রথম সোপানের মধ্যে অন্তর্গত করে ধর্ম সাধনায় ইহার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। গীতাও দানকে যজ্ঞ ও তপস্যার সাথে চিত্তশুদ্ধির অন্যতম উপায় হিসেবে নির্দেশ করেছে। কোনরূপ ফল বা উপকার কামনা না করে বা কষ্টবোধ না করে, লোক হিতার্থ এবং কর্তব্যবোধে দান করলে পার্থিব আকর্ষণ দূর হবে।

(৭) দয়া

গীতায় দয়াকে দৈবী সম্পদের অন্যতম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (৬/৪৭)। মুক্তিকামী প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই ইহার অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য। কায়মনোবাক্যে ও কর্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে অনুগ্রহ করার ইচ্ছাকে দয়া বলে। দয়া হতে উদ্ভূত অপর একটি গুণের নাম করুণা। ভক্তি মতে ভগবৎকৃপা লাভ করতে হলে সর্বভূতে দয়া অপরিহার্য,[২৮] কারণ তিনি নিজেই সর্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।

উপর্যুক্ত গুণসমূহ অনুশীলনের ফলে ভক্তের চিত্ত সম্যক পরিশুদ্ধ হয় এবং ভগবৎগুণ শ্রবণ মাত্র অনায়াসে এবং শ্রীঘ্র চিত্ত তাঁতে নিবিষ্ট হয়; ফলে ব্রহ্মভাব লাভে তিনি সমর্থ হন।

৪.৩. মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে ভক্তি

প্রাচীন ভাগবৎধর্মে ভক্তিকে অতি প্রাধান্য দেওয়া হত এবং ভগবৎলাভের প্রায় শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করা হত। ভগবান নারায়ণ ঋষি বলেছেন যে, বেদসমূহ এবং আশ্রমসমূহ অর্থাৎ

বেদানুযায়ী সমস্ত আশ্রমের লোকগণ নানা মতে সমাস্থিত হয়েও যদি ভক্তি সহকারে তাঁর সম্যক পূজা করে, তবে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি শীঘ্র তাদেরকে সদ্‌গতি প্রদান করেন।[২৯] নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হয়েছে যে শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মাগণ ভক্তির দ্বারাই জগৎকারণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন। গীতায়ও ভক্তিযুক্ত নিষ্কামকর্মীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কৃষ্ণ বলেন, "সকল যোগীর মধ্যে সেই আমার মতে যুক্ততম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতমযোগী) যে আমাতে অন্তকরণ রেখে শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভজন করে।"[৩০] (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে, ভগবৎভক্তি ব্যতীত নিষ্কামকর্ম শোভা পায় না, তা ব্যর্থ (১/৫/১২:১২/১২/৫২)। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায় এবং ইন্দ্রিয় সংযম তথা অপর যেসকল শ্রেয়োজনক কর্ম আছে, তৎসমস্তেরই একমাত্র সাধ্য-ভগবানে ভক্তি (১০/৪৭/২৪)। ভক্তির মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেন, "আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সে সকল ভক্তেই অবস্থান করি। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হয়ে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু বলে মনে করবে। কেননা সে যথার্থ নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিযুক্ত হয়েছে। সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, তুমি সর্ব সমক্ষে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয়না। কেননা হে পার্থ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যারা পাপযোনিসম্ভূত অন্তজঃজাতি, তারাও আমার আশ্রয় নিলে নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন।"[৩১] অতঃপর কৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবানের ভক্ত হতে উপদেশ দিয়ে বলেন, "তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান হও. আমার পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে মৎপরায়ন হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকে প্রাপ্ত হবে" (গীতা ৮/৬৫)।

৫. ঐশী প্রেমের অবস্থা

ঐশী প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তার চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং প্রেমের চেয়ে শ্রদ্ধা ও ভয়ের অনুভূতিই ভক্তের বেশি থাকে। তিনি অনুভব করেন ঈশ্বর হলেন এ জগতের স্রষ্টা ও শাসক। এ সময়ে ভক্তের লক্ষ্য হচ্ছে কীভাবে সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়। কিন্তু যখন ঈশ্বরে ভালোবাসা জন্মে তখন ভক্ত আর এ ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন না। তাঁর কাছে তখন ঈশ্বর হন প্রেমময় এবং ঈশ্বরের প্রেম তার চিন্তা, অনুভূতি এবং অনুরাগের একমাত্র চালিকাশক্তি হিসেবে পরিণত হয়। তাঁর প্রতি ভালোবাসার প্রভাবে তার হাত কর্ম করে, তার মন চিন্তা করে, তার হৃদয় অনুভব করে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ভক্ত কেবল

ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ আরো গভীর হলে সে ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং সহানুভূতির প্রতি মনযোগী হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি তার আরো গভীর মনোযোগের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে ঈশ্বরকে সে নিজের জন্য অনুসন্ধান করে, সে অনুভব করে যে সে-ই তিনি; তিনিই সে। এই অনুভূতি সাধকের সামর্থ এবং স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন ভক্তিমূলক ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের এসব ভক্তিমূলক অনুরাগ বা ভক্তিরস পাঁচ ভাবে প্রকাশিত হতে পারে। যথা- শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস, মধুররস। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বে ভক্তের সাথে ভগবানের এ সম্পর্ককে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই স্তরগুলোর প্রত্যেকটি সফলভাবে অতিক্রম করার পরই ঈশ্বরের সাথে ভক্তের অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। এর প্রত্যেকটি স্তরে ঈশ্বরের সাথে ভক্তের পারস্পরিক ভালোবাসা থাকে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ভক্ত ঈশ্বরকে ভালোবাসে ঈশ্বরও ভক্তকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভালোবাসেন। যদিও ঈশ্বর ভক্তের সাথে প্রভু, পিতা, মাতা, বন্ধু অথবা প্রেমিকের ভূমিকা পালন করতে পারেন তবু তিনি হলেন প্রভু।

৫.১. ঐশী প্রেম ও ঈশ্বরের করুণা

যখন কোন ভক্ত ঈশ্বরের সাথে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের পর্যায়গুলো অতিক্রম করে ঐশী সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেন তখন তিনি ঈশ্বরের প্রিয় ভক্তে পরিণত হন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন। এর ফলে তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করেন এবং বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিত কোন মানুষই পরমাত্মার জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ করতে পারেন না। এমনকি তার প্রতি প্রেম ভক্তিও জন্মে না। তাই শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, উত্তম রূপে বেদাধ্যয়ন, মনের ধারণা বা চিন্তাশক্তি অথবা বহু লোকের নিকট শ্রবণ দ্বারা ইহাকে পাওয়া যায় না। এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন অর্থাৎ যোগ্য বলে গ্রহণ করে তিনিই তাঁকে পেয়ে থাকেন। তারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।[৩২]

বস্তুত যারা ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করেন, ঈশ্বর তাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর হলেন পরম প্রভু, তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাঁর ভক্তের পাপ বিনাশ করেন এবং ভক্তি লাভ তার জন্য সহজতর করেন। যিনি আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমার্পণ করেন, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখতে পান। এ ধরনের গভীর

ঈশ্বরানুরাগী ঈশ্বরের একজন একনিষ্ঠ প্রেমিকে পরিণত হন। ঈশ্বর তার প্রেমিক ভক্তের পথ থেকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অপসরণ করেন, তাকে অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখেন, তার মনকে বিশুদ্ধ করেন এবং তাঁর বুদ্ধিকে আলোকিত করেন যাতে সে তাঁকে জানতে পারে।[৩৩] অতএব যেহেতু মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন সেহেতু মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাকে ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৫.২ গৌণী ও পরাভক্তি

ভক্তির পথ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির এবং ঈশ্বরোপলব্ধির ক্রমোন্নতিমূলক পথ। এই পথে ব্যক্তির ঈশ্বরানুরাগ নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। ঈশ্বরানুরাগের নিম্নতর স্তর হলো গৌণী ভক্তির স্তর এবং উচ্চতর স্তর-পরাভক্তির স্তর। কাজেই ভক্তি দু'প্রকার। যথা- গৌণীভক্তি ও পরাভক্তি। এই গৌণী ও পরাভক্তিকে শঙ্করাচার্য ও নিম্বার্ক যথাক্রমে স্থূল ও অপরা এবং সূক্ষ্ম ও পরাভক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫.২.১ গৌণীভক্তি: গৌণীভক্তিতে ঈশ্বরানুরাগের সাথে আত্মানুরাগ মিশ্রিত থাকে। এই স্তরে ভক্ত তার কোন কাম্য বস্তু লাভের জন্য ঈশ্বরোপসনায় ব্রতী হয়। সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণভেদ হেতু অথবা আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী- এই তিন প্রকার ভক্তভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার-সাত্ত্বিক, রাজাসিক ও তামসিক। এ তিন প্রকার ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান কপিল বলেন, "যে ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন ক্রোধী পুরুষ অন্তরে হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য নিয়ে আমাকে ভজনা করে সে আমার তামস ভক্ত। বিষয়, যশঃ বা ঐশ্বর্য কামনা করে যে ভেদদর্শী ব্যক্তি প্রতিমা প্রভৃতিতে আমার অর্চনা করে সে রাজস ভক্ত। আর যে ব্যক্তির ভেদভাব যায় নাই কিন্তু পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের প্রতি কামনায় কর্তব্যবোধে উপাসনা করেন তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত।"[৩৪] অন্যদিকে কোন বিপদে পতিত হয়ে উদ্ধার লাভের জন্য ভগবানকে ডাকার নাম আর্তভক্তি, ভগবানকে জানবার নিমিত্তে একান্ত আগ্রহতাই জিজ্ঞাসু ভক্তির লক্ষণ ; ধন-জন, দারা-পুত্র, বিষয়-বিভব, মান-সম্মান পাবার জন্য ভগবানকে ডাকাই অর্থার্থী ভক্তের লক্ষণ। সকল প্রকার গৌণভক্তিই নিকৃষ্ট ভক্তি। কিন্তু কিছুদিন সাধনা করলেই ইহা উৎকৃষ্ট ভক্তিতে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আর্ত জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ভক্ত ছাড়াও গীতায় জ্ঞানী (অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী) নামে অপর একপ্রকার ভক্তের উল্লেখ রয়েছে (৭/১৬)। সকল প্রকার ভক্তের মধ্যে এই জ্ঞানীভক্ত শ্রেষ্ঠ; কেননা তিনি সতত (ভগবানে) যুক্তচিত্ত এবং তাতেই ভক্তিমান (৭/১৭)। তিনি পরিশেষে উপলব্ধি করেন বাসুদেবেই সমস্ত; এইরূপ জ্ঞানলাভ করে তিনি তাঁকে প্রাপ্ত হন। গীতার এই জ্ঞানী ভক্তই নারয়ণীয়াখ্যানের একান্তীভক্ত।

৫.২.২ পরাভক্তি: ভক্তিযোগের সর্বোচ্চস্তর হল পরাভক্তির স্তর। ইহা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও অনুরাগের পরিপক্ক স্তর। দীর্ঘ কাল যাবৎ ভক্তিযোগের অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হয়। এই স্তরে ভক্ত নিজের জন্য কিছুই কামনা করে না, ঈশ্বরই তার একমাত্র ধ্যানের বস্তু হয় এবং ঈশ্বরের কাছে সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। তখন তার যা কিছু থাকে তা ঈশ্বরের সিদ্ধান্তেই থাকে, তিনি যা কিছু করেন তা ঈশ্বরের সেবার জন্য করেন এবং তিনি যে সকল বস্তু দর্শন করেন তাতে তার প্রিয়তমা ঈশ্বরকেই দেখেন।

তাই গীতায় বলা হয়েছে "ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে পর তিনি প্রসন্নচিত্ত হয়ে নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক করেন না বা অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। যিনি এরূপে পরাভক্তির দ্বারা আমাকে স্বরূপত জানতে পারেন, তিনিই বুঝতে পারেন- আমি কে, আমার কত বিভাব, আমার সমগ্র স্বরূপ কী; এবং এরূপে আমাকে স্বরূপতঃজেনে তদন্তর তিনি আমাতে প্রবেশ করেন"(১৮/৫৪-৫০)। এরূপ পরাভক্তের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে "আমার ভক্ত কাউকে দ্বেষ করেন না, তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু ও ক্ষমাবান, তিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার বর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, শুভ-অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব বর্জিত-সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি উদাসীন হয়েও অনলস, গৃহে থেকেও গৃহাদিতে সমত্ববুদ্ধি হীন। যিনি মৎপরায়ণ হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্মের আচরণ করেন, তিনিই আমার প্রিয়ভক্ত"(১২/১৩-২০)। পরাভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

পরা ভক্তির লক্ষণ

ক) পরাভক্তি লাভ করলে মানুষ সিদ্ধ হয়, মরণ ভয় অতিক্রম করে এবং পরম তৃপ্তি লাভ করে।

খ) পরাভক্তি লাভ হবার পর ভক্ত আর কোন বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন না।

গ) ভক্ত উন্মাদের ন্যায় আচরণ করে।

ঘ) লৌকিক বা বৈদিক কর্মসমূহে আসক্তি ত্যাগ হয়।

ঙ) ভক্ত ঈশ্বর ভিন্ন সকল আশ্রয় ত্যাগ করে প্রিয়তমাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন।

চ) ঐশী প্রেম লাভ করে প্রেমিক কেবল এই প্রেমই দর্শন করেন, এই প্রেম শ্রবণ করেন, এই প্রেম বর্ণনা করেন, এই প্রেম চিন্তা করেন। অর্থাৎ সকল কিছুকে ঈশ্বরময় দেখেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি হিন্দুধর্ম অনুসারে ভক্তি পথের প্রতিটা সম্মুখ পদক্ষেপ নৈতিক জীবনের অগ্রগতিমূলক পদক্ষেপ। তাই নৈতিকতার ক্ষেত্রে ভক্তির গুরুত্ব হলো যিনি ভক্তি মার্গের অনুশীলন করেন তিনি সকল প্রকার স্বার্থপরতা, ঘৃণা, অহংকার, গর্ব, হিংসা, ক্রোধ, উদ্ধিগ্নতা, সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, পার্থিব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ, অসৎ চিন্তা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব ত্যাগ করে দয়া-মায়া, প্রেম-ভালোবাসা, পরার্থপরতা, সৎ চিন্তা, সৎ স্বভাব ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হন। ফলে তিনি নিজেকে যেরূপ ভালবাসেন অপরাপর মানুষ তথা জীবকেও অনুরূপ ভালবাসেন। এভাবে তিনি এক উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হন। নৈতিকতা সম্পর্কে তাদের এই চিন্তাধারা নৈতিকতার মানদণ্ড সম্পর্কিত পূর্ণতাবাদের সাথে কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ। পূর্ণতাবাদের মূল বক্তব্য হলো-জৈববৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে উন্নত নৈতিক জীবন-যাপন করা। আবার ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায়, মানুষ যতই ঈশ্বরকে ভালোবাসে তাঁর ইচছাকে শ্রদ্ধা করে ততই তিনি পার্থিব জীবনের কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হন। এভাবে মানুষ তার মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হন; তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম ফলকে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করেন। ফলে তার অহংবোধ লুপ্ত হয়; তিনি যে একটি স্বাধীন সত্তা এবং নিজের ভাগ্যের নির্মাতা এই চিন্তা থেকেও বিরত থাকেন এবং তিনি তার আত্মাকে পরমাত্মার অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে কেবল তাঁর উপর নির্ভর করেন। আত্মার এই জ্ঞান মানুষকে একদিকে মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে অন্যদিকে মানুষের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণের দিকে পরিচালিত করে। এভাবে যিনি ঈশ্বরকে তার প্রেমাস্পদ হিসেবে ভালোবাসেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ও মহত্ত্বসহ তার নিকট প্রকাশিত হন। ফলে ভক্ত এক পরম আনন্দ উপভোগ করেন। ইহাই হলো চূড়ান্ত মুক্তি। ভক্তি বা অনুরাগই ভক্তকে মুক্তির দিকে পরিচালিত করে, তবে মোক্ষ প্রাপ্ত অবস্থায় ভক্তের আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে হারিয়ে যায় না বরং ব্রহ্মের সাথে পরম আনন্দ উপভোগ করেন। তাই উপনিষেদ বলা হয়েছে- যিনি আত্মাকে প্রাপ্ত হন তিনি সেই আনন্দময় পুরুষকে লাভ করে স্বয়ং আনন্দ অনুভব করে। কাজেই মোক্ষহলো পরম পুরুষকে বা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মে স্তিতি লাভ করা।

তথ্যনির্দেশ

১. *বৃহদারণ্যক উপণিষক*, ২/৪/৫, অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেষ চন্দ্র ঘোষ, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, অখণ্ড সংস্করণ,-১৯৯৪।

২. দেবর্ষি নারদ, *ভক্তিসূত্র*- ৫৪, দ্রষ্টব্য, স্বামী বেদান্তানন্দ, '*ভক্তি প্রসঙ্গ*' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে দেবর্ষি নরদ বিরচিত ভক্তি সূত্রের ব্যাখ্যা)।

৩. S.N. Dasgupta, *Hindu Mysticism* (London: The open court publishing co., 1972), p. 130.

৪. *Loc. Cit.*

৫. স্বামী বিবেকানন্দের মতে প্রেমের লক্ষণ তিনটি। প্রকৃত প্রেম এই তিনটি লক্ষণ ব্যতীত থাকতে পারে না- (১) প্রেমে লাভ ক্ষতির প্রশ্ন নেই, (২) প্রেমে কোনরূপ ভয় নেই, (৩) প্রেম উচ্চতর আদর্শ।

৬. *গীতা*, ৪/১০, সম্পাঃ জগদীশচন্দ্র ঘোষ (কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ষষ্ঠ বিংশতিতম সংস্করণ, ১৯৯৬)।

৭. ঐ, ১৮/৬৫।

৮. *ভাগবত পুরাণ*, ১০/৩৩/৩৬।

৯. মোঃ মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শনঃ মানুষ ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০ইং), পৃ ২৭।

১০. S.C. Chatterjee, *The Fundamental of Hinduism: A philosophical Study* (Calcutta: University of Calcutta, 7th ed., 1970), p. 173.

১১. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৪), পৃ. ৭৬।

১২. Mariasusai Dhavamony, *Love of God, According to Saiva Siddhanta* (Londond: Oxford University Press, 1971), p. 14.

১৩. Sidney Spencer, *Mysticism in World Religion* (USA: A S Barners & Inc., 1966), p. 49.

১৪. ডঃ তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদঃ করুণাময় গোস্বামী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১৪, থেকে উদ্ধৃত।

১৫. S.N. Dasgupta, *Op. Cit.*, p. 124.

১৬. *Ibid.* p. 125.

১৭. পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে আছে-

> "বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্‌বৈষ্ণব উদ্যতে।" (৬৯/৩.১)
> "বিষ্ণোরয়ং যতঃ প্রোক্তোহ্যতো বৈ বৈষ্ণবো মতঃ।" (৮৩/২.১)
> পদ্মপুরাণের অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, বিষ্ণু হতে বিষ্ণুধ্যানে তৎপর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের পার্থক্য করতে নেই; কেননা সে বিষ্ণু হয়। (৩০/১৬)

১৮. *পদ্মপুরাণ*, *পাতাল খণ্ড*, *৩০/১৪.২*

১৯. *পদ্মপুরাণ* (শব্দকল্প তদ্রুপমে ধৃত)

২০. গীতা, ১৮/৫৪,৫৫,৫৭, ৭/১৭-১৮, ৮/৭, ৯/২৭, ১১/৫৫, ১২/৬-৭, ৬/২৯, ২/৪৮, ৫৩

২১. *কঠ উপনিষদ*, ১/৩/১২ অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেষ চন্দ্র ঘোষ (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৯৪)।

২২. *(বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণ*, *৭/১১/৮-১২*

২৩. *মহাভারত*, *অনু. ১৪৫/১১/৬০-৮৫*

২৪. *ভাগবত পুরাণ*, *১১/১৯/৩৮*

২৫. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, *২/৪/৫*

২৬. *যোগী যাজ্ঞবল্ক্য*, *২/১২-১৩*

২৭. *শঙ্করাচার্যকৃত সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ ১২৯-৩১*

২৮. *ভাগবত পুরাণ*, *৭/৬/১৯-২৪*

২৯. *মহাভারত*, *১২/৩৩৪/৪৩*

৩০. *গীতা*, ৬/৪৭

৩১. *ঐ*, ৯/২৯-৩২

৩২. *কঠ উপনিষদ*, ১/২/২৩, *মুণ্ডক উপনিষদ*, ৩/২/৩

৩৩. *গীতা*,১০/১০, ১১/৫৩-৫৪

৩৪. *ভাগবত পুরাণ*, ৩/২৯/৮-১০

----------ooo----------